Ahana
Peer-reviewed Bilingual Yearly on Visual Art and Culture
Volume - VII | 2021
e-mail : editorahana@gmail.com
Web : www.ahanajournal.in
ISSN : 2278 - 1994

দেশভাগ থেকে বাংলাদেশ: মুর্তজা বশীরের খোঁজে

দীপ্তি রানী দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারাংশ : *বাংলাদেশের নাগরিক আধুনিক শিল্প-ইতিহাসে মুর্তজা বশীর একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী। ব্রিটিশ শাসনের পটভূমিতে মুর্তজার জন্ম, তারুণ্যের সাথে বোঝাপড়া পাকিস্তান পর্বে এবং পরিণতকাল পার করেছেন বাংলাদেশে। মুর্তজার ব্যক্তি ও শিল্পসত্তা বারবার মুখোমুখি হয়েছে খণ্ডিত দেশ ধারণার। নিজস্ব দেশ ও রাজনৈতিকভাবে আরোপিত রাষ্ট্র কীভাবে সংলাপ তৈরী করে শিল্পের সাথে, তা পাঠের সুযোগ করে দেয় শিল্পী মুর্তজা বশীর ও তার শিল্পকর্ম। এই প্রবন্ধ দেশভাগের পটভূমিতে শিল্পী মুর্তজা বশীরের শিল্পসত্তার প্রকরণ বোঝার একটি প্রয়াস।*

মূল শব্দমালা : *নাগরিক, দেশভাগ, দেশ, আকাঙ্ক্ষা, অস্তিত্ব।*

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্; শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ। তার রিডিং টেবিলে, দেরাজে কিংবা উপহার দেওয়া বইতে মোহিতলাল মজুমদার, সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, দীনেশ চন্দ্র সেন-এর নাম দেখা যায়।[১] কিন্তু বহুভাষাবিদ পণ্ডিত এই ব্যক্তিত্ব আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু নয়। বরং পণ্ডিত শহীদুল্লাহ্‌র সাথে নানা ক্ষেত্রের অন্য পণ্ডিতদের সম্পর্ক ও খ্যাতি কাছ থেকে দেখে যিনি মোহাক্রান্ত হয়েছেন, হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সাথে পরিচয়ের আগেই গন্তব্যের মোহাবিষ্ট চূড়াকে ধরতে চেয়েছেন, শহীদুল্লাহ্‌র সেই কনিষ্ঠ সন্তান মুর্তজা বশীর এর কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের নাগরিক আধুনিক শিল্পচর্চায় যিনি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হিসেবে গণ্য। ব্রিটিশ শাসনের পটভূমিতে মুর্তজার জন্ম, তারুণ্যের সাথে বোঝাপড়া পাকিস্তান পর্বে এবং পরিণতকাল বাংলাদেশে। এই পরিভ্রমণের মধ্যেই মুর্তজার শিল্পসত্তা নির্মিত হয়েছে। এই প্রবন্ধ রাজনীতি সচেতন শিল্পী মুর্তজা বশীরের শিল্পসত্তার প্রকরণ বোঝার একটি প্রয়াস। এই প্রকরণ পাঠ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, শিল্পী মুর্তজার ব্যক্তি ও শিল্পসত্তা বারবার মুখোমুখি হয়েছে খণ্ডিত দেশ ধারণার। নিজস্ব দেশ ও রাজনৈতিকভাবে আরোপিত রাষ্ট্র কীভাবে সংলাপ তৈরি করে শিল্পের সাথে, তা পাঠের সুযোগ করে দেয় শিল্পী মুর্তজা বশীর ও তার শিল্পকর্ম। দেশভাগের রাজনীতি এখানে শিল্পীর শিল্পসত্তা পাঠের প্রাসঙ্গিকতায় আলোচিত হবে মাত্র।

শিল্পীর মৃত্যুর (১৫ আগস্ট, ২০২০) পর পত্র-পত্রিকাজুড়ে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংলাপ ও অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। তাঁর মধ্যে সাধারণকে আকৃষ্ট করা বিষয়টি হলো, তাঁর বিখ্যাত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। জাহিদ রেজা নূরের ভাষ্যে লেখা 'তিনি হতে চেয়েছিলেন প্রধান শিরোনাম' [২] সকলের দৃষ্টি কাড়ে। এই প্রবন্ধও শিল্পীর বিখ্যাত হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাটির সূত্র ধরেই অগ্রসর হবে। তার শিল্পকর্ম ও টেক্সটের পরিপ্রেক্ষিতেই তা পাঠের সুযোগ আছে। পিতার মতো বিখ্যাত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বিবেচনায় নিয়ে শিল্পীর ব্যক্তি-সত্তার নির্মিতির পাঠ-প্রকরণ একইসাথে দেশভাগ থেকে বাংলাদেশ জন্মের রাজনৈতিক-প্রভাব ভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখার সুযোগ করে দেয়।

১. পঞ্চাশের দশক: মুর্তজা বশীরের নির্মিতির কাল

মুর্তজার শিল্প-প্রবণতাগুলোর নির্মিতির কাল ও নির্মাণকে পাশাপাশি রেখে দেখার জন্য পঞ্চাশের দশক গুরুত্বপূর্ণ। এই দশকেই তিনি ঢাকার শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হচ্ছেন। যাচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পকে দেখার প্রাতিষ্ঠানিক গুণ আয়ত্ত করছেন। এই দশকেই শিল্পী ফ্লোরেন্সে চিত্রকলা এবং ফ্রেসকো নিয়ে পড়াশোনা করেন। তারপরও জারি থাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তার এই বহুমাত্রিক জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া। ১৯৫৮ সালে ফ্লোরেন্সে তিনি প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী করেন 'পাকিস্তানি চিত্রকর: মুর্তজা বশীর' শিরোনামে। ১৯৫৯ সালে 'চব্বিশটি পেইন্টিংস' নিয়ে করাচি ও ঢাকায় প্রদর্শনী হয়।[৩]
ফলে এই দশকে শিল্পীর জীবন ও শিল্পকর্মে উপস্থিত যে প্রবণতাগুলোকে বিবেচনায় নিতে হয় —

১। শিল্পশিক্ষার জন্য ঢাকার চারুকলায় পড়ার বিষয়ে শহীদুল্লাহ্‌র আগ্রহ ছিল না। তারপরও রাজি হওয়ার সময় তিনি চেয়েছিলেন, পড়তে হলে মুর্তজা যেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেই যান। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে তিনি ঢাকার আর্ট কলেজেই ভর্তি হয়েছিলেন।[৪]

২। শিল্পকে কারিগরি জায়গা থেকে না দেখে তত্ত্বীয়ভাবে পাঠের প্রবণতা তৈরী হয়। এক্ষেত্রে দুটি প্রভাবক কার্যকারণ শনাক্ত করা যায়- প্রথমত, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পিতার সাহিত্যগুণ ও পারিবারিক পরিবেশ। দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্টতা। শিল্পকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আর্ট কলেজে ভর্তির আগেই তার একটি স্কুলিং হয়। বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন তার অটোগ্রাফ খাতায় লিখেছিলেন, 'আর্টিস্টের কাজ হলো শোষিত জনগণের ভাব ও দুঃখ-দুর্দশাকে চিত্রের ভিতর দিয়ে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা যাতে সমাজে সে আর্ট নবজীবন সৃষ্টি করতে পারে।'[৫] মুর্তজা এই কথাগুলোকে পরবর্তী শিল্পী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হিসেবে বিবেচনা করছেন।[৬]

৩। শিল্পের বহু শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। ছবি আঁকা ছাড়াও ফ্রেসকো, ম্যুরাল, লিথোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। 'নদী ও নারী'র মতো সফল চিত্রনাট্য লিখেছেন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস লিখেছেন। চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন, সুলতানি আমলের মুদ্রা নিয়ে গবেষণা করেছেন।

৪। পঞ্চাশের দশকে নিজের জাতীয়তাবাদী পরিচয়কে সামনে রেখে ফ্লোরেন্সে প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী করেছেন।

এবার পঞ্চাশের দশকের ছবিগুলোর দিকে তাকানো যাক। ছবিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে — (১) প্রামাণ্য তৈরীর প্রবণতা, (২) স্থানিক অপরিচয়, (৩) স্থানিক বা বাংলাদেশের পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা।

অন্য তিনভাবেও সাজানো যায় : (১) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি, (২) ইউরোপীয় আধুনিকতার হাতেখড়ি, (৩) নিজস্ব নিরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়।

প্রথমভাগের কাজগুলোয় প্রামাণ্য তৈরীর প্রবণতা থাকলেও বাংলাদেশ পরিচয়টি দ্বিধাহীন শনাক্ত করা যায় কেবল একটি কাজে। 'মাছধরা' কাজটি মুর্তজার চিত্রকর্মের গ্যালারিতে যেন আকস্মিক হামলা করা কোন ইমেজ। বাকী কাজগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রবণতা-প্রধান কাজ হিসেবে ধরলেও তাতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের স্থানিক প্রবণতা নেই। যদিও তিনি দেখেছেন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা তখন আমবাগানে ছাওয়া।[৭] এই ঝাড়-জংলার দেশের শিল্পী মুর্তজার ছবি পরিব্রাজকের অ্যালবামের মতো বয়ানধর্মী। সুনির্দিষ্ট কোন একটি প্রবণতা বা বিষয়ে তিনি স্থির হতে পারেন না বা চান না।

কিন্তু মুর্তজা কি পরিব্রাজক? ঢাকার আর্ট কলেজে পড়ে তার সমকালীন প্রায় সকল শিল্পীই ইউরোপের দ্বারস্থ হয়েছেন। ফিরে এসেছেন দেশে। দেশভাগের অভিজ্ঞতায় জারিত ও পাকিস্তান পর্বে শিল্পের মঞ্চে স্থান পাওয়া সকল শিল্পী কলকাতা, ইউরোপের পাশাপাশি করাচি ও লাহোরের দিকে প্রলুব্ধ চোখ রেখেছেন। কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্র, ইউরোপ ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ডের কেন্দ্র এবং করাচি বা লাহোর পাকিস্তানের কেন্দ্র। ফলে শিল্পীদের এই পরিভ্রমণ মূলত ক্ষমতার চারপাশে বৃত্তায়ন। এই বৃত্তায়নে মুর্তজাও অন্যদের মতো সামিল হয়েছেন। তাহলে তার কাজে পরিভ্রমণ শুরুর বিন্দুটি কীভাবে শনাক্ত করা যায়? কেন তার গ্যালারি পরিব্রাজকের প্রামাণ্য হয়ে ওঠে বা আদৌ হয়েছে কিনা? তাই দেখা জরুরি মুর্তজা বশীর 'দেশ' বলতে কী বোঝেন বা তার পক্ষে 'দেশ' বলতে কী বোঝা উচিত বা তার 'দেশ' পাঠের বাস্তবতা কী?

মুর্তজা বশীরের জন্ম ১৯৩২ সালে ঢাকায়। শহীদুল্লাহ্‌র জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার পেয়ারা গ্রামে। কলকাতায় শিক্ষাজীবন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের আবাসিক ভবনে মুর্তজার জন্ম। বলা যায় মুর্তজার জন্ম তৎকালীন এক প্রভাবশালী পণ্ডিতের ঘরেই না শুধু, ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি ক্ষমতাধীন বাংলায়। কলকাতা বনাম ঢাকার মধ্যে কেন্দ্র বনাম প্রান্তিকতার যে সংলাপ ও দূরত্ব, মুর্তজার সামনে তা লঘু করে দিয়েছিল শহীদুল্লাহ্‌র খ্যাতি ও যোগাযোগের পরিধি। পূর্ব-বাংলার রাজধানী ঢাকার বাইরে পিতার চাকরিসূত্রে মুর্তজা যখন বগুড়ায় মেট্রিকুলেশনের দিকে হাঁটছেন, তখন ভাগাভাগি হচ্ছে দেশ। দেশভাগ কীভাবে নাড়া দিয়েছিল মুর্তজাকে তার কোন সরাসরি ভাষ্য তার লেখায় পাওয়া যায় না। অন্যান্য শিল্পীর মতোই এক নীরবতা এই কথক শিল্পীর মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। নীরবতা বা দৃশ্যহীনতা কি কোনো বিষয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা মুর্তজার কাছ থেকেই নিতে পারি। নীরবতা দৃশ্যকে অস্বীকার করলে তাকে বিমূর্ত ভাষাও বলা যায়। বঙ্গাব্দ ১৪০৮-এ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত তার লেখা বই 'মুর্তজা বশীর: মূর্ত ও বিমূর্ত'-এ 'বিমূর্ত' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন 'মুর্তজা'র শিল্পী পরিচয়টা সবাই জানে। যা জানে তা মূর্ত আর আমার যে পরিচয় লোকে জানে না তাকে বিমূর্ত বলেছি।'[৮] তাই এই বোধ তার বিমূর্ত শিল্পপাঠের ক্ষেত্রেও এখানে বিবেচ্য। ফলে নীরবতা বা বিমূর্ততা মূলত আমাদের অজ্ঞতা বা লুকিয়ে থাকা মুর্তজা। আমরা এই মুর্তজার খোঁজে তার-ই দ্বারস্থ।

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় অর্থনৈতিক সংকট প্রসঙ্গে তিনি বারবার বলেছেন, 'আমার তো আর গ্রামের বাড়ি নেই, বা মামার বাড়ি নেই।'[৯] এই 'নেই' শব্দে অস্তিত্বে প্রবিষ্ট হওয়া 'নেই' বোধকেই মূর্ত করছেন? কী নেই? গ্রামের বাড়ি বা মামার বাড়ি যাদের দেশের ভেতরেই আছে, তারাই-বা এই আশি বছর বয়সে কতবার যায়? নিশ্চিতভাবেই বাবার বা মামার বাড়ি যাওয়া না যাওয়ার সাথে শহরে স্থিত হওয়া পঞ্চাশোর্ধ্ব যেকোন মানুষেরই আছে-নাই-বোধ জন্ম নেওয়ার সুযোগটি কম। ফলে এই বোধ জন্মের সাথে তার বেড়ে ওঠার পুরো প্রক্রিয়াটি বিবেচ্য। এর মধ্যেই হয়তো পরিব্রাজক জীবনের অন্তরালে অস্তিত্বের প্রশ্নের সাথে 'নেই' বোধ জারিত হয়ে আছে।

পূর্ব-বাংলায় জন্ম ও বেড়ে উঠলেও দেশভাগের আগ পর্যন্ত মুর্তজা জানতেন তার বাবার বাড়ি আছে। অস্তিত্বের সংকটে এই 'আছে'-বোধ মানুষকে কোন না কোনভাবে আশ্রয় দেয়। মুর্তজার বেড়ে ওঠার কাল থেকে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও, পূর্ব-প্রজন্মের ভূমিসূত্রে মানুষের মননে এই 'আছে'-বোধ এখনও পরাক্রমশালী। ফলে দেশভাগ বাবার বা মামার বাড়ি থেকে যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে, তার সাথে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সম্পর্ক না থাকলেও মানস-সংস্কৃতিতে বিপর্যয় ডেকে আনে। এই বিপর্যয় একটি ধীর সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। ফলে এটা হয়তো ক্রমে একটা বাধ্যতামূলক বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়-কাজের সন্ধানে ফেরারী শহীদুল্লাহ্‌র পুত্র মুর্তজার কাছে। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ সরব নয়। কিন্তু অস্তিত্বের প্রশ্ন জোরালো হলেই এই 'নেই'-বোধ ভাষা পেয়েছে।

বাবার চাকরিসূত্রের পাশাপাশি মুর্তজাকে দেশভাগের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে আগলে রেখেছে কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে সংযুক্তির অভিজ্ঞতা। ক্লাস নাইনে পড়াকালেই মুর্তজা ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী। তখন থেকেই তার ইচ্ছে মার্কস, অ্যাঙ্গেলস, লেনিন বা স্তালিনের ছবি আঁকার।[১০] নিঃসন্দেহে এখানেও তিনি বিখ্যাত ও ক্ষমতাবান অবয়ব নির্মাণের প্রতিই আকৃষ্ট হন। দেশভাগের পর কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন বগুড়ায় এলে তাঁর কাছ থেকেই শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি দিকনির্দেশনা পান। ফলে দেশভাগের পর যেমন বাবার চাকরিসূত্রটি অখণ্ড থাকে, তেমনি কমিউনিস্ট রাজনীতির সূত্রে একটি আন্তর্জাতিক অখণ্ডতাবোধ হয়তো তার কৈশোরকে প্রকাশ্য ও প্রকট বিচ্ছিন্নতাবোধের ব্যাপকতায় আচ্ছন্ন করেনি। বরং মুর্তজার খ্যাতি-মোহের মানসপটে তার বাবাই তখন তাঁর কাছে এক 'দেশ' হয়ে আছে।

তার প্রামাণ্য তৈরির প্রবণতার স্মারকবাহী কাজগুলোতে নাগরিক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতাটিই প্রধান। 'ওভারটাইম' কাজে ও শিরোনামে উদ্‌বৃত্ত শ্রম ধারণা ও তার সাথে মালিক শ্রেণি সম্পর্কে একটা বোঝাপড়ার পাঠ নিতে দেখা যায়, যা আর অন্য কোথাও পরে স্থান পায় না। একুশে ফেব্রুয়ারির যে মুহূর্তকে তিনি উডকাটে ধরেছেন, তা তার নিজের অভিজ্ঞতার অনেক নিকটবর্তী।[১১] মাধ্যমও নির্বাচন করেছেন ছাপচিত্র। ফলে একটি রিপ্রোডাকশন ধারণা ও তৎকালীন পরিস্থিতির সম্পর্কসূত্র এতে ধরা পড়ে। 'বুড়িগঙ্গার হোটেল' ছবিটি বিষয়ের দিক থেকে যেমন নাগরিক, তেমনি ইম্প্রেশনিস্ট শৈলীতে গড়া বোটের অবয়ব তৈরি করেছে তৎকালীন শৈল্পিক আভিজাত্য। স্থানিকতা, স্থানিক মানুষ বা নৌকার সাথে জলের আন্তঃসম্পর্ক; কিছুই এখানে ঠাঁই পায়নি।

দ্বিতীয় ধাপে চোখ রাখলে দেখব, শিল্পীর কাজে 'দেশ' বা স্থানিক পরিচয় নির্মাণের দৃশ্যমানতা নেই। এই ধাপের কাজগুলো পাশাপাশি রেখে দেখলে মানুষের অবয়বের গঠনে, আচরণে সংস্কৃতিতে বাঙালিকে শনাক্তের মতো কোনো লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং পিকাসো'র শৈলী ও পিকাসোর সংস্কৃতির মানুষই এখানে প্রতিনিধিত্বশীল। পঞ্চাশের দশকে ঘনকবাদের (কিউবিজম) প্রভাবে

চিত্র-১ : দ্য ট্রেজেডি, ১৯০৩, পাবলো পিকাসো

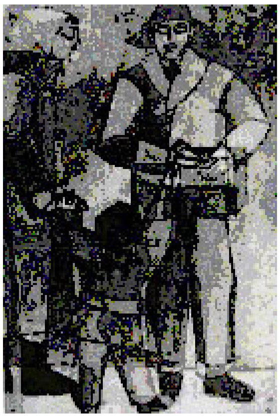

চিত্র-২ : জিপসী, ১৯৫৮, মুর্তজা বশীর

করা কাজগুলো ও তাদের শিরোনাম নিয়ে পিকাসোর কাছে গেলে মুর্তজার পিকাসো পাঠের নিবিড়তা বোঝা যায়। সচেতনভাবেই এখানে 'প্রভাব' না বলে 'নিবিড় পাঠ' বলছি। কারণ, ইউরোপে গিয়ে অন্যান্য শিল্পীর মতোই তৎকালীন আধুনিক শিল্প-দেশ পিকাসো'র প্রভাব বলয়ে ঢুকলেও মুর্তজা দ্রুতই তা থেকে বেরিয়ে আসার সচেতন উদ্যোগ নেন। এই উদ্যোগ যেমন দেশে, মেতনি ফ্লোরেন্সেও তার মধ্যে দেখা যায়। পদবিতে ও পরিচয়ে অস্বীকার করে পিতার বিপরীতে যেমন পিতার মতোই এক শক্তিশালী ব্যক্তি-খ্যাতি নির্মাণে উদ্যোগী হন,[১২] তেমনি একক ক্ষমতার অধিপতি হিসেবে অনুকরণের বদলে পিকাসোর বিপরীতে তিনি আরেক শক্তিশালী সত্তা নির্মানে বরং আগ্রহী হন। এই সাহস বোধ হয় মুর্তজা তার বাবার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বাবার মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই অর্জন করেছিলেন। যা বাংলাদেশের শিল্পের ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে নিজের পরিচয় নির্মাণের একটি প্রতিযোগী প্রয়াস বলা যেতে পারে। তাই দেখা যায়, তিনি মূলত পিকাসোর শৈলী নির্মাণ প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করেছেন নিজের কাজের মধ্যে। বলছেন, তার কাজ পিকাসোর ঘনকবাদ নয়। নতুন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন নিজের কাজের বৈশিষ্ট্যকে স্বকীয়তা দিতে; 'ট্রান্সপারেন্সিজম'।[১৩]

তৃতীয় ধাপে তিনি যেসব কাজে ভঙ্গিমায়, পোশাকে বাঙালি পরিচয় জড়িয়েছেন, তাতে তার নিজস্ব শৈলীই গুরুত্ব পেয়েছে। বাঙালিয়ানা সেখানে দ্যোতক মাত্র।

ফলে অন্যদের মতো করে তার ছবিতে পোষাকে বা বাহ্যিক অবয়বে স্থানিকতার বা দেশ পরিচয়ের অনুসন্ধান নেই। বরং

চিত্র-৩ : দ্য টু সিস্টারস, ১৯০২, পাবলো পিকাসো

চিত্র-৪ : চিরন্তনী বোন, ১৯৫৯, মুর্তজা বশীর

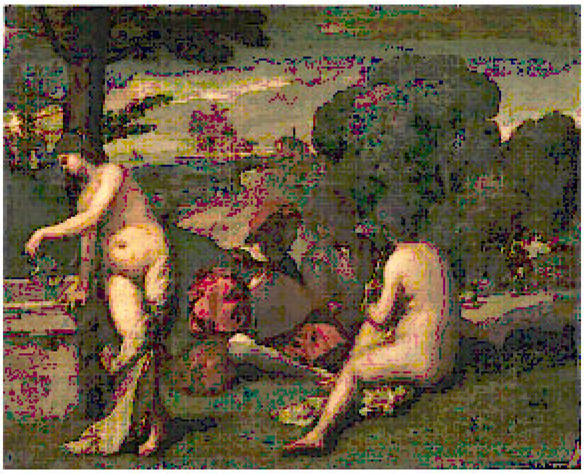

চিত্র-৫ : তিশিয়ান, পেস্টোরাল কনসার্ট, ১৫০৯

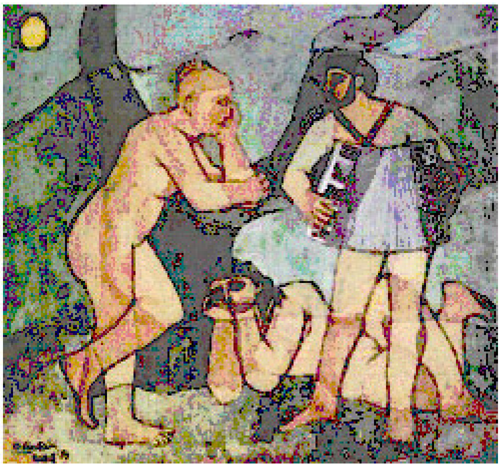

চিত্র-৬ : দুই প্রেমিকের জন্য সঙ্গীত, ১৯৫৯, মুর্তজা বশীর

তিনি 'দেশ' ধারণা নির্মানে ইচ্ছুক, যা নিজ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চান। এখানে ব্যক্তির ক্ষমতার মধ্য দিয়ে দেশ প্রকাশিত হতে চায়। তাই তার প্রথম প্রদর্শনীর শিরোনামটিই পাকিস্তান পর্বে আত্মপরিচয় নির্মাণের একটি ইশতেহার।

২. দেয়াল, এপিটাফ, দি উইং এবং 'বিমূর্ত বাস্তবতা'

মুর্তজা বশীর নিজের কাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিল্পের ইতিহাসে একইসঙ্গে তার তাত্ত্বিক অবস্থানকেও শক্তিশালী করেছেন। কামরুল হাসানের 'বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন' প্রবন্ধের পর মুর্তজা বশীর আরেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী, যিনি বাংলাদেশের শিল্পের রাজনীতি ও বাস্তবতাকে নির্দ্বিধায় ও যৌক্তিকভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। এই প্রবণতায় তিনি যখন নিজেই নিজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো নির্বাচন ও ব্যাখ্যা করেন, তখন তার মধ্যে কেবল মুর্তজা বশীরের শিল্পের বাস্তবতা প্রকাশ পায় না, উন্মোচিত হয় বাংলাদেশের শিল্পের রহস্যময়তাও। 'দেয়াল' বা 'এপিটাফ' কাজগুলোর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার পাশাপাশি তিনি এর পটভূমিও জানাচ্ছেন অকপটে, যেখানে বন্ধুদের দেখাদেখি বিমূর্ত কাজের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যেও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ভবানী সেনকে পুরোপুরি মুছে দিতে পারেন না। এই না পারার পেছনে শুধু অতীত স্মৃতি নয়, যুক্তি বা তথ্য দিয়ে শিল্পকে দেখার যে চোখ তার ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে, তাকেও অস্বীকার করতে পারেন না। ফলে তিনি যে নতুন শৈলীতে পা রাখতে চান, সেখানেও নিজস্ব যুক্তির অনুসন্ধান করেন। আর এই সন্ধিবদ্ধ যুক্তিটি হচ্ছে: 'বিমূর্ত বাস্তবতা', যা তার পরবর্তী বিমূর্ত কাজের আশ্রয়।

চিত্র-৭: দেয়াল-৩০, ১৯৬৭, মুর্তজা বশীর

'বিমূর্ততা' তার শৈল্পিক ভাষ্য ও তৎকালীন বাস্তবতা। আর 'বাস্তবতা' তার অতীতকে পাঠ ও ভবিষ্যৎকে নির্মাণের প্রকরণ ও আশ্রয়, তথা 'দেশ'। এখানে তিনি তুলনামূলক স্থিত। বলা যায়, এখানে তিনি দৃশ্যগত ভৌগোলিক দেশকে স্বীকার বা আশ্রয়ের বদলে ভবিষ্যবাদী এক আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন, যা আপাতদৃষ্টিতে বিমূর্ত হয়ে যায়। লুকিয়ে যায়, নীরব হয়ে পড়ে। দেয়াল, এপিটাফ বা দি উইং-সিরিজগুলো করার সময়, তার মধ্যে পুনরাবৃত্তি ও নিমজ্জন একইসঙ্গে কাজ করে। এখানে তিনি শারীরিক দৃশ্যমানতায় আর আগের মতো পরিব্রাজক নন। বরং একটি ভূখণ্ডে স্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা এলে তিনি দৃশ্য থেকে সংকটে পরিভ্রমণ শুরু করেন। 'দেয়াল' সিরিজকে সীমায়নকে চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে তার বিমর্ষতার প্রকাশ হিসেবে দেখলে এপিটাফ তার সমাধির চিহ্ন এবং 'দি ইউং' একটি আকাঙ্ক্ষা বিন্দু। আর এসবই বিমূর্ত হয়ে আছে মুর্তজার মধ্যবয়স পর্বে।

দেয়ালকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পাঠের সুযোগ রয়েছে, যেখানে মুর্তজার অবস্থান— 'আমি তো কখনোই ন্যাশনালিস্ট ছিলাম না।'[১৪] ভারতবর্ষ ভাগ, পাকিস্তানের বিলুপ্তি ও বাংলাদেশের জন্ম - এই বারবার খণ্ডায়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। ১৯৩২ সালে জন্মানো মুর্তজার ১৯৭১ সালে বয়স প্রায় চল্লিশ। ১৯৭০-এ শিক্ষক হতে ব্যর্থ হয়ে আবার করাচি ফিরে গেলেন। তিনি বলছেন, 'আমার মার্কেট তখন পাকিস্তানে; করাচি, লাহোর ইত্যাদি। ঢাকায় আমার ওয়ান ম্যান শো খুব কম, মানে পাকিস্তান পিরিয়ডে খুব কম, একটা না দুইটা।'[১৫] দেশভাগের মধ্য দিয়ে পিতা-মাতার সূত্র ধরে শেকড় থেকে উচ্ছেদ,স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পুনরায় নিজের শিল্পী পরিচয় ও টিকে থাকার লড়াই থেকে ছিটকে পড়া, বাংলাদেশে ফেরা এবং এখানে নতুন করে বাধ্যতামূলক একটি লড়াইয়ে সামিল হওয়া। এই লড়াইয়ে বাবা নেই, কমিউনিস্ট পার্টি নেই (মুর্তজার সাথে ব্যক্তিক বিচ্ছেদ), আন্তর্জাতিক পরিচয়ের ঘর ও ঘরানা তখন জাতীয়তাবদের ঘেরাটোপে সংকুচিত । এই সবই মুর্তজার জন্য তৈরি করে কেবল বিচ্ছেদ ও ক্রমসংকোচনের অভিজ্ঞতা। পিতার মধ্যে যে বৃহত্তকে তিনি দেখেছিলেন, যে বৃহত্তে নিজেকেও একদিন সত্য করে তুলবেন ভেবেছিলেন, তা তার খ্যাতির মধ্যপর্বে 'শেষের কবিতা'র ঘটির জলের মতো সংকুচিত পরিসরে আটকে যায়। এ থেকে মুক্তির লড়াই স্থানিক কোনো ' দেশ' চেতনার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সহজ নয়, হয় না। যদি আরোপণকে সত্য করে না তোলে কেউ। তাই মুর্তজা দেখেন- ' An Artist, specially after 1945, lives in time rather than space, and has no choice but to struggle for becoming universal in the real sense. [১৬]

৩. মুর্তজা বশীরের নারী : নিজের কাছে ফেরা

প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন থেকে শুরু করে জীবনের নানা পর্বে মুর্তজা বশীর নারীকে ছবির বিষয়বস্তু করেছেন। ১৯৬২ সালে

বিয়ের পর তার ছবির বিষয়বস্তুতে বিশেষ করে রঙে পরিবর্তনের কথা বলা হলেও এর মধ্যে তাৎক্ষণিকতা বা নারীকে পরিব্রাজক হিসেবে দেখার চোখটিই যেন কাজ করেছে। নব্বইয়ের দশকে তার কোলাজে নারী নির্মাণের সাথে প্রথম জীবনে ফ্লোরেন্সে তাঁর নারী অভিজ্ঞতার শিহরণই জারি থাকে । যা তাঁর উপন্যাসেরও রূপকল্প। এই উপ-মহাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় জারিত না হলে তার ছবিতে নারী তুঁলুজ লুত্রেক-এর মতো দৃশ্যমানতা অর্জন করত কিনা - এই প্রশ্নের উত্তরে মুর্তজা এই সম্ভবনাকে খারিজ করে দেন না। বাইজেন্টাইন চিত্রপ্রীতির ছায়ায় বসে পূর্ণ শাড়ি পরিহিতা মুর্তজার নারীরা দর্শকের দিকে চেয়ে থাকে। তারা অমৃতা শেরগিলের নারীদের মতোই মঞ্চে স্থবির, কিন্তু পাথুরে চোখে দর্শককে ইমেজ পাঠে আগ্রহী করে। এই শাড়িপরিহিতারা আর সিরিজ নয়। নানা ভিন্ন শিরোনামে মুর্তজার ক্যানভাসে শেষ জীবন পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হন তারা। এই 'বিমূর্ত' সিরিজের মধ্য দিয়েই পরিব্রাজক মুর্তজার ঘরে প্রত্যাবর্তন মূর্ত হয়। এসব ছবিতেই বাঙালি স্থানিক পরিচয়ে নারীরা দাপটের সঙ্গে মুর্তজার ক্যানভাসে হাজির হয়। এই প্রথম বাঙালি পরিচয়টি পোষাকের মধ্য দিয়ে মুর্তজার শৈলীতে প্রকট হয়। কিন্তু এই নারী বাংলার নারী নয়, যতটা মুর্তজার ব্যক্তিগত নারী। পোশাকে স্থানিক পরিচয় থাকলেও শারীরিক গঠন, রং ও বিন্যাস জয়নুলের 'পাইন্যার মা', কামরুলের 'তিনকন্যা' বা সফিউদ্দিনের 'ময়ূরাক্ষীর ধারে'র নারীদের মতো নয়। ফ্লোরেন্স, লাহোর বা করাচির অভিজ্ঞতায় পাওয়া নারীদের ছায়াই এসব শাড়ি পরিহিতাদের মধ্যে পড়েছে। একইসঙ্গে নিজস্ব শ্রেণি অবস্থানটিও তাদের চিত্রায়ণে প্রকাশ পেয়েছে।

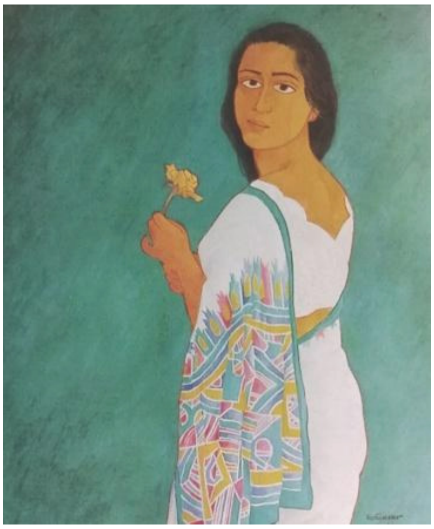

চিত্র-৮
হলুদ গোলাপ হাতে রমণী,
২০০৩, মুর্তজা বশীর

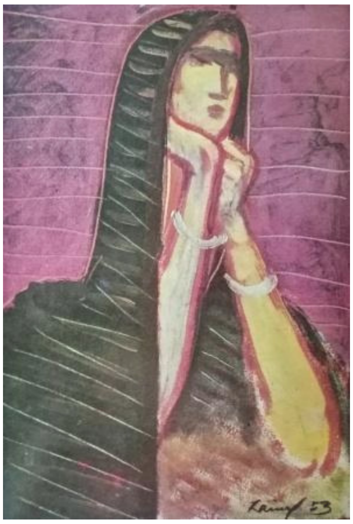

চিত্র-৯
পাইন্যার মা, ১৯৫৩,
জয়নুল আবেদিন

প্রশ্ন হলো, অঘোষিত এই নারী সিরিজে তিনি কি নারীর রূপে বাঙালিয়ানা নির্মাণ করতে চান? একে কি তার 'দেশ' চেতনার রূপ ভাবার সুযোগ আছে? পরিব্রাজক মুর্তজাকে সামগ্রিক বিবেচনায় দেখলে একে তার একটা স্থিতির আধার হিসেবে দেখতে হয়, যা দেশ চেতনার নয়, যা এক ব্যক্তিক গণ্ডি ধারণার, যার মধ্যে তিনি একসময় নিজেকে সীমায়িত করেন। ফলে এতেও জারি থাকে নানামাত্রিক বিচ্ছিন্নতাবোধ। নারীর চোখে আঁকা বিষাদ হতে পারে তার নিজস্ব বিষাদেরই আরোপণ।

৪। মুর্তজা বশীরের 'দেশ' / পরিশেষ

মুর্তজার শিল্প ও জীবনের অভিজ্ঞতার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বলা যায়, প্রথমত বাবার মতো হওয়ার স্বপ্নচুর মনোভূমি, দেশভাগের আগেই বাবর চাকরিসূত্রে ভ্রাম্যমাণ জীবনের সাথে খাপ খেয়ে থাকা পটভূমি এবং কমিউনিস্ট রাজনীতির আন্তর্জাতিকতা বোধ— এই তিন বৈশিষ্ট্যতার পরবর্তী মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। ফলে বিচ্ছিন্নতাবোধে-এর কাছে তাত্ত্বিক পথে না, রাজপথের মিছিলেও না, বরং তার অস্তিত্বের দাবিটিই আত্মসমর্পণ করেছে।

তারুণ্যের প্রারম্ভে এই অস্তিত্বের মধ্যে নিজের কাঙ্ক্ষিত 'দেশ' নির্মাণের একটা সংগ্রাম ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্তি থেকে ভাষা আন্দোলন- রাজপথের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে যেমন মুর্তজার সংগ্রামকে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি বিদেশে প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীর সময় 'পাকিস্তানী চিত্রকর' হিসেবে নিজেকে পরিচয় করানোর প্রচেষ্টার মধ্যে এ 'দেশ' নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম তিনি জারি রাখেন। সাক্ষাৎকারে জানচ্ছেন— '.... এক জয়নুল আবেদিন ছাড়া এখানে আর কোনো আর্টিস্টেরই নাম বলা যাচ্ছে না। আমি তিরিশ

বছর বয়সে পাকিস্তানের সবচেয়ে নামকরা আর্টিস্ট। আমার লড়াইটা ছিল, তোমরা শুয়োরের বাচ্চারা আমাকে পাকিস্তানি আর্টিস্ট বল, হোয়াই ইউ আর ব্র্যান্ডিং মি অ্যাজ ইস্ট পাকিস্তানি আর্টিস্ট? ... আমাকে পাকিস্তানি আর্টিস্ট বল। তোরা যদি পাকিস্তানি আর্টিস্ট হস, আমি শালা ইস্ট পাকিস্তানি আর্টিস্ট হব ক্যান?[১৭]

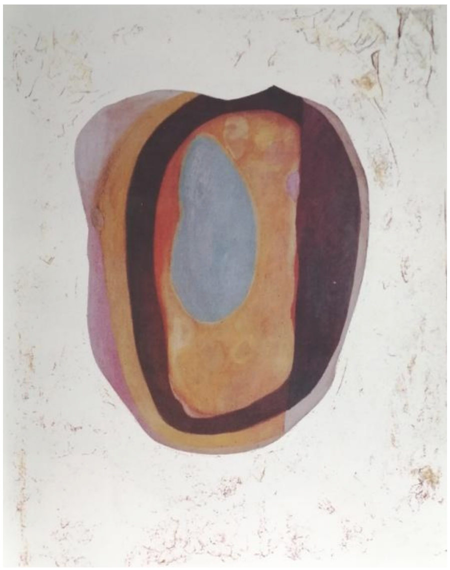

চিত্র- ১০: শহীদ শিরোনাম-১৭, ১৯৭৩/১৯৭৫
মুর্তজা বশীর

ভাষা আন্দোলনের সাথে মুর্তজার সম্পর্ক এবং পরবর্তী দূরত্ব ও অভিমান, দেশীয় রাজনীতির প্রতি তার অসততার অভিযোগ[১৮] - এই 'নেই' বোধকে অনেকাংশেই মূর্ত করে তোলে। সব শেষে যখন দেশে স্থিত হয়েছেন, তখন আসলে কোথায় ফিরেছেন? তার আঁকা বিতর্কিত 'কলেমা তৈয়বা' সিরিজকে কীভাবে দেখা যায়? মুর্তজা জানাচ্ছেন, 'কলেমা তৈয়ার'র মতো ক্যালিগ্রাফিক সিরিজকে কেন্দ্র করে তার প্রগতিশীলতা বিতর্কের মুখে পড়েছে।[১৯] এই বিতর্ক এখনও জিইয়ে আছে - স্বীকার করে বা এড়িয়ে গিয়ে। কেন একে এড়ানোর প্রচেষ্টা? বরং এর বদলে কার্যকারণ অনুসন্ধান জরুরি। 'জ্যোতি' সিরিজ সম্পর্কে নিজের বইয়ে লিখেছেন— 'সমাজে শিল্পীর অহং-এর কানাকড়ি দাম নেই। মনে হতো এই বিত্তবানদের দুয়ারে ধর্না ছবি বিক্রির আশায় এ যেন ভিক্ষাবৃত্তি। একদিকে এক শ্রেণির মানুষের প্রাচুর্য আর অন্যদিকে অনিশ্চয়তার ঘেরা জগৎ, তবুও আমার করার কিছুই নেই। সবকিছু যেন নিয়তি। ফলে বলা যেতে পারে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে ফেললাম অদৃষ্টের কাছে।[২০]

ক্ষুদ্রার্থে হলেও ব্যক্তি মানস-গড়নে আরও কিছু ভূমিকা রেখেছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিল্পচর্চায় দক্ষতার অভাবে অভিযুক্ত, তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোন থেকে শিল্পকে দেখার প্রবণতা (ঢাকা চারুকলায় এই প্রবণতা তখন নেই), পিতার সামাজিক স্ট্যাটাসের কারণে জন্ম নেওয়া অহং-বোধ এবং ব্যক্তিগত জীবনাচরণের কারণে অন্যদের সাথে দূরত্ব ও দ্বন্দ্ব-এসবই প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে, কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণের সহজাত প্রেরণার পাশাপাশি পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পরে আবার এই প্রান্তেই তাকে ফিরতে হচ্ছে।

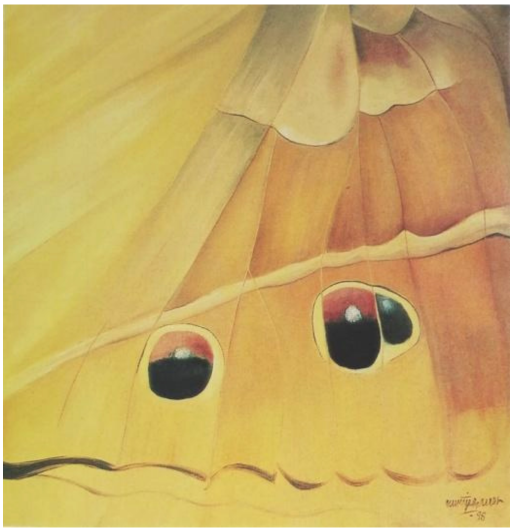

চিত্র- ১১: পাখা- ১৪, ১৯৯৮, মুর্তজা বশীর

তিনি মূলত এক ক্লান্ত পরিব্রাজক- যিনি দেশহীন। বৃহৎ দেশ ধারণা থেকে ক্রমেই সংকোচনের মুখে পড়েছেন এবং বাধ্যতামূলক বিচ্ছিন্নতাকে গ্রহণ করেছেন, যাকে ঠেকানোর যোগ্যতা তার থাকে না। দেশভাগ থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন মুর্তজাকে নিয়তীবাদী বাস্তবতার দিকে ঠেলে দেয়। এর পেছনে ভাষা আন্দোলনের ব্যর্থতাকে নিশ্চিতভাবেই বিবেচনায় নিতে হবে। আবার 'পানশালার কর্ণার' ও 'মাছধরা' কাজ দুটিকে পাশাপাশি রেখে বিবেচনা করলে কোনটি তার নিজের শ্রেণি এবং কোনটি 'এক্সোটিক', তা তার সমগ্রতার মধ্যে প্রতিফলিত শ্রেণি চেতনা দিয়ে পাঠের সুযোগ করে দেয়।

তাই 'বিমূর্ত বাস্তবতা' মুর্তজার নিজস্ব বাস্তবতা, যা বাংলাদেশের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে একটা সার্বজনীন গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত। মুর্তজা তার এই বাস্তবতাকে নিজেই শনাক্ত করেন। তিনি জানেন তার কার্যকারণ। 'আমার পরিবার কখনো মুসলিম লীগ করেনি। একমাত্র মুসলিম পরিবার। পাকিস্তান চাইনি। আমার বাপও চায়নি।'[২১] তাই স্থানিক জাতীয়তাবাদ পরিব্রাজক মুর্তজার কাজে নাই হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি নীরব থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত পরিধিতে আশ্রয় নেন। আর তিনি আহ্বান করেন এক সমরূপ বিশ্ব নির্মাণের— 'We may not forge into a world community literally, but spiritually we must unite and build a homogeneous civilization.'[22]

তথ্যসূত্র :

১) বশীর, মুর্তজা। আমার ছেলেবেলা। *আমার জীবন ও অন্যান্য*। বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ (দ্বিতীয় প্রকাশ), ঢাকা ২০১৮, পৃ.২৩।

২) নূর, জাহিদ রেজা। তিনি হতে চেয়েছিলেন প্রধান শিরোনাম। দৈনিক প্রথম আলো (www.prothomalo.com), ১৬ আগস্ট, ২০২০।

৩) হাই, হাসনাত আবদুল। Art of Bangladesh Series-11 : মুর্তজা বশীর। সম্পা, সুবীর চৌধুরী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ ১১৪।

৪) বশীর, মুর্তজা। শিল্প পাঠের প্রথম পর্ব। *আমার জীবন ও অন্যান্য*। বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ (দ্বিতীয় প্রকাশ), ঢাকা ২০১৮, পৃ. ২৭-২৮।

৫) বশীর, মুর্তজা। জীবন ও চিত্র। *আমার জীবন ও অন্যান্য*। বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ (দ্বিতীয় প্রকাশ), ঢাকা ২০১৮, পৃ. ৩৮-৩৯।

৬) বশীর, মুর্তজা। জীবন ও চিত্র। *আমার জীবন ও অন্যান্য*। বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ (দ্বিতীয় প্রকাশ), ঢাকা ২০১৮, পৃ. ৩৮-৩৯।

৭) বশীর, মুর্তজা। ফার্মগেট-কারওয়ান বাজার ছিল ঝোপঝাড়ে ঢাকা। *আমার জীবন ও অন্যান্য*। বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ (দ্বিতীয় প্রকাশ), ঢাকা ২০১৮, পৃ. ৩০৮।

৮) বশীর, মুর্তজা (৭ ডিসেম্বর, ২০১৪)। সাক্ষাৎকার গ্রহণ দত্ত, দীপ্তি রানী।

৯) বশীর, মুর্তজা (৭ ডিসেম্বর, ২০১৪)। সাক্ষাৎকার গ্রহণ দত্ত, দীপ্তি রানী।

১০) বশীর, মুর্তজা। আমার ছেলেবেলা। *আমার জীবন ও অন্যান্য*। বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ (দ্বিতীয় প্রকাশ), ঢাকা ২০১৮, পৃ. ২৩।

১১) বশীর, মুর্তজা। একুশের চেতনা। *আমার জীবন ও অন্যান্য*। বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ (দ্বিতীয় প্রকাশ), ঢাকা ২০১৮, পৃ. ৭৪।

১২) বশীর, মুর্তজা।। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও আমি। মুর্তজা বশীর : মূর্ত ও বিমূর্ত। পূর্বা, চট্টগ্রাম, ভাদ্র ১৪০৮, পৃ ১১৯।

১৩) বশীর মুর্তজা। জীবন ও চিত্র । *আমার জীবন ও অন্যান্য*। বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ (দ্বিতীয় প্রকাশ), ঢাকা ২০১৮, পৃ. ৪২ ।

১৪) বশীর, মুর্তজা (আগস্ট ২০১৯)। সাক্ষাৎকার গ্রহণ দত্ত, দীপ্তি রানী।

১৫) বশীর, মুর্তজা। ছবি আঁকাটা আমার কাছে প্রার্থনার মতো। সাক্ষাৎকার গ্রহণ দত্ত, দীপ্তি রানী। *উত্তরাধিকার*, বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ০২, নবপর্যায় ৮০। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ৩২।

১৬) বশীর, মুর্তজা। *মুর্তজা বশীর : মূর্ত ও বিমূর্ত।* পূর্বা, চট্টগ্রাম, ভাদ্র ১৪০৮, পৃ. ১৮৪।
জাপানের ফুকুওকা আর্ট ম্যুজিয়ামে ৩রা নভেম্বর ১৯৮০ তে সমকালীন এশিয়ান শিল্পকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়মে পঠিত। পৃ. ১৮২ - ১৮৪।

১৭) বশীর, মুর্তজা। ছবি আঁকাটা আমার কাছে প্রার্থনার মতো। সাক্ষাৎকার গ্রহণ দত্ত, দীপ্তি রানী। *উত্তরাধিকার*, বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ০২, নবপর্যায় ৮০। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ৩১।

১৮) World, Adhora. 14 June 2019, Murtaza Baseer: a national and international figure. http://youtube/E-qbSWye9jU

১৯) বশীর, মুর্তজা। আত্মজীবনী: তৃষিত নদী। আমার জীবন ও অন্যান্য। বেঙ্গল পাবলিকেশনস্ (দ্বিতীয় প্রকাশ), ঢাকা ২০১৮, পৃ. ৪৩৮।

২০) বশীর, মুর্তজা। শিল্পী মুর্তজা বশীরের নিজস্ব ভুবন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ উল্লাহ, এস এম আমিন ও ইসলাম, আমীরুল। *নোঙর*। চট্টগ্রাম, অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ. ২৫৭।

২১) বশীর, মুর্তজা। ছবি আঁকাটা আমার কাছে প্রার্থনার মতো। সাক্ষাৎকার গ্রহণ দত্ত, দীপ্তি রানী। *উত্তরাধিকার*, বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ০২, নবপর্যায় ৮০ বাংলা একাডেমি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ৩৯।

২২) বশীর, মুর্তজা। Art of Bangladesh। *মুর্তজা বশীর: মূর্ত ও বিমূর্ত*। পূর্বা, চট্টগ্রাম, ভাদ্র ১৪০৮, পৃ. ১৮৬।
যুক্তরাজ্যের আরভিং, টেকসাসে জুন ১৮-২০, ১৯৯৯ সালে ৪র্থ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে অনুষ্ঠিত চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনে পঠিত।